চণ্ডিকার উদরে বৃশ্চিক

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যটন মানুষের এমন এক প্রবণতা যা সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে বিকশিত এবং সূক্ষ্মও হয়েছে। এর মধ্যে দ্রষ্টা মানুষের এক বিবর্তনও লক্ষ করা যায়। আমাদের জ্ঞান ও শিল্পান্বেষা শুধু নয়, জীবনযাপনও এক পর্যটন। আক্ষরিক ও লঘু অর্থে তা ভ্রমণ।

সহজে এবং আরাম-আয়াসে যেসব ট্যুরিস্ট-স্পটে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব সেসবই এখন আবর্জনাস্তূপ, ভীড় সেসব স্থান কলুষিত করেছে। পর্যটন পরিস্থিতির সঙ্গে সাহিত্যের, সাহিত্যপাঠের, রসাস্বাদনের সাদৃশ্য কোনও অভিনব আবিষ্কার নয়। এই প্রসঙ্গের অবতারণা অন্য কারণে। প্রযুক্তিপুষ্ট হওয়ায় আমাদের স্থানান্তরিত হওয়া মাখনমোলায়েম আজ। তবু অনেকে এ পথ মাড়াতে চান না। দুর্গমস্থান খোঁজেন। মেগাসিটির আরাম তাঁদের কাছে মলমূত্র। তাঁরা চান বাঁচাটা গড়েপিটে নিতে।

সাহিত্য পর্যটনে আরাম আয়াসের নাম বিনোদন। এই বিনোদিনী আর আনন্দকন্যা এক কথা নয়। সংকটে পড়তে হয় যখন বিনোদনের সঙ্গে আনন্দকে গুলিয়ে ফেলা হয়। বা বিনোদনের একটিই স্বৈররূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। যেমন, গোটা পৃথিবীর মানুষকে প্যান্টসার্ট পরিয়ে পাবলিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দেশ-কাল-ঐতিহ্য নির্বিশেষে পশ্চিমী গণতন্ত্র চাপানো হয়েছে তাঁদের ঘাড়ে, সেইরকমই হতে হবে লেখাপড়ার ব্যাপার এবং শিল্পটিল্পও। উদ্ভট প্রশ্ন, পাগলামি—বরদাস্ত করা হবে না। বিপুল-বিশাল এই শৃঙ্খলা-জালটিতে একটি, দুটি ফুটো পর্যন্ত রাখা হয়নি। ছিদ্রের আশঙ্কা নির্মূল করতে আছে কড়া নজরদারি।

জনমনোরঞ্জক সাহিত্য সর্বদেশে, সর্বকালেই ছিল—ধরে নিতে পারি। তার বিনোদন ধর্ম স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সাহিত্যের জন্ম সাহিত্যের গর্ভে (সম্পূর্ণত) যা সাহিত্যের বিকাশ ও পুষ্টিতে এক পর্যটন, সাহিত্যকে প্রশ্ন করে, তার সংজ্ঞা বদলানোর স্পর্ধা দেখায়, তাকে আক্রমণ করে—জনমোহিনী সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এ আলাদা জাত। তার ব্যর্থতা, সাফল্য আলাদা।

সাহিত্য ব্যবসায়ীদের এতে রুষ্ট হবার কোনও কারণ দেখি না। বিশেষ করে এই গরিব দেশে দু-পাঁচজন লেখক এই করে দুটো পয়সা রোজগার করছেন, বালবাচ্চা নিয়ে সংসার চালিয়ে মারুতি-টারুতি চাপতে পাচ্ছেন, এ কম কথা নয়। এই বিভাজন তবু তাঁদের পীড়া দেয়, সেজন্য একটা মরিয়া চেষ্টা চালান সীমান্তরেখা মুছে ফেলতে এ-কাজে তাঁদের দোসর পুস্তক সমালোচক মাস্টাররা, মান্ধাতার আসলের সিলেবাস উগড়ে যাঁদের পেট চলে।

কেন এই চেষ্টা (অনুপ্রবেশের), কেন সব তালগোল পাকাতে হয় ?
ওই প্রশ্নের দুটি জবাব ভাবা যেতে পারে, একটি সাহিত্য ব্যবসায়ী লেখকদের দিক থেকে, অন্যটি বাংলা বইয়ের সীমিত এবং অপরিণত বাজারের দিক থেকে ।
সাহিত্যসেবা কথাটা আজকাল আর কেউ বলেন না ঠিকই কিন্তু ধারণাটি রয়ে গিয়েছে। মহৎ একটি কাজ করছেন, সাহিত্যজীবীরা তা প্রমাণ করতে চান। তা না হলে শ্রদ্ধা ভক্তি কাড়া যায় না। সমাজের বাবা-কাকা হওয়া যায় না। ব্যবসার স্বার্থেই এটা দরকার। আর তাই শঙ্কর বা অতীতে বিমল মিত্রের মতো সাহিত্যজীবীদের তরল-জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রতিনিধি খাড়া করে তীর ছোড়া হয়েছে। এভাবে সীমান্ত লোপাট করে তথাকথিত মেনস্ট্রিমের মধ্যেই সাহিত্যের গোটা মানচিত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। যেন এর বাইরে আর কিছু নেই। ঠিক ভোটদাতা নাগরিকের অবস্থা, হয় কংগ্রেসকে ভোট দাও না হলে সি পি এমকে।
বাজারের দিক থেকেও এর সমর্থন মিলবে। গণ-মানসে লেখক দেবতা, সর্বজ্ঞ লেখক, তিনি উদাসীন, রোম্যান্টিক, স্বপ্নের জনক সাধারণের ঊর্ধ্বে এক ব্যক্তি। তাঁকে ঘিরে একটি জ্যোতি-বলয় থাকা চাই, নাহলে বই বিক্রি সহজ হবে না। রশিদ খান বোমা ফাটালে তাঁর বিবৃতি চাই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নিভে গেলে সেই ছাইয়ের উপর চাই তাঁর পদচিহ্ন, বন্যা হলে তিনি, ধর্ষণ হলে, ভোট হলে, কিছুই না হলে কেন কিছু হচ্ছে না সেজন্যও তাঁর মত জানতে হবে। তাঁর এই উপস্থিতি নম্বর টেন সিগারেটের স্টিকারে পর্যন্ত লক্ষ করা গিয়েছে। এই অতিমানব, জীবনের থেকে বড় মাপ ব্যবসার এক অনিবার্য শর্ত।

গাঁজড়ার গল্প ॥
এ নিবন্ধে আমাদের প্রসঙ্গ 'খেলার প্রতিভা' একটি দীর্ঘ গদ্য রচনা। তারই মুখপাত হিসাবে উপরের কয়েকটি অনুচ্ছেদ মনে হতে পারে তেমন অপরিহার্য ছিল না। এ তর্ক মুলতুবি থাক। ১৯৭০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য বলে যা বহুজন কর্তৃক সমাদৃত, প্রচারিত ও পুরস্কৃত হয়েছে 'খেলার প্রতিভা' সেই গোত্রভুক্ত নয়, শুধু এ কথাটাই বলতে চাওয়া হয়েছে।
'খেলার প্রতিভা'য় আমরা দেখতে পাব বাংলার গ্রাম, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, আচার ও বহুজন সমাজের এক পটচিত্র। গর্বের অতীত থেকে উৎখাত, দুর্ভিক্ষপীড়িত এক জনসমষ্টি, গ্রাম চলেছে অন্নের দেশের খোঁজে। চলমান এই গ্রাম দেখি আমরা। দেখি তার গার্হস্থ্য ইতিহাস। শুনি হেঁয়ালি, রসিকতা।
কিন্তু এই গ্রাম বৃত্তান্ত পশ্চিম অনুসারী বাস্তবতা নয়। আবার রবীন্দ্র যুগের ভদ্রলোক সংস্কৃতির মোড়কবন্দিও নয়। লেখক কমলকুমার মজুমদারের থেকে অনেক বড় এখানে কথক কমলকুমার। গ্রাম ও যৌথ জীবনের সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলি গ্রন্থটিতে বেশির ভাগ জায়গা দখল করেছে। বলা যেতে পারে এ এক বিমূর্তায়ন। যার দুটি

স্তর থাকলেও বেদী যৌথের সংস্কৃতি, যৌথের চেতনাস্পর্শী! লোকসংস্কৃতির চালচিত্রে শহুরে, শিক্ষিত, উচ্চ বর্গের কিছু সাংস্কৃতিক বোধ ও ধ্যান-ধারণা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই রীতি দু'য়ের ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতাকেই স্পষ্ট করে। ব্রেখটিয় অ্যালিয়েনেশন এফেক্টের মতো।

'খেলার প্রতিভা' একদমে পড়ে ফেলা অসম্ভব, এ যত টানে, দূরেও ঠেলে ঠিক ততোটাই। শুধু ভাষাশৈলী নয় চিত্রকল্পের এক সাঙ্কেতিক লিপি যেন। যার একটি অভিধান রচনার কথাও ভাবতে পারেন কেউ।

'সাবধানতা! এখনও সাবধানতা বশে ক্রমে তাহারা ভেড়ী পথ হইতে নামিল, সকলে মিলিত একটি গতি, একটি তাজ্জব কীট সদৃশ। তবুও নিশ্চিত যে এইখানে রামধনু বেগোড় হইবে না।

'এই কীট রামধনুকে প্রভাবিত করণের সূত্রত্ব বহিতেছে; তাহারা ভোর হইতে জাত হইল, তাহারা অদ্ভুতক্রমে চলিতে আছে। যখন ডান দিকে টাল সামলাইবে তখন তারা গো-পালক, যখন পিঠের উপর টাল ন্যস্ত করিতেছে তখন পিতৃত্ব; এইভাবে অনন্তকাল যে চলন—তাহার কিয়দংশ, এখন যেহেতু ফরসা হইয়াছে মাত্র, পরিষ্কার মীমাংসা করা যায় যে উহাদের মধ্যে আছে। প্রখর তাপেই যাহা নিশ্চিহ্ন হয়।'

এইটি চিত্র। শরীর দিয়ে গড়া, গ্রন্থের অন্যত্র হাড় দিয়ে গড়া চিত্রও আছে। যা বিশাল কীট তাই আবার রামধনু। অদ্ভুতক্রম চলন এক মাত্রা, তাতে পিতৃত্ব, গো-পালকত্ব ইত্যাদি ছবি মূর্ত হয়, রূপ পরিগ্রহ করে। সদা এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ, এই হয়ে ওঠার সৃজন প্রক্রিয়া 'খেলার প্রতিভা'। শরীর এখানে জীবনের অনেকখানি, শরীর-ভাষা থার্ড থিয়েটারের ঢঙ, রীতি আত্মসাৎ করেছে গ্রামটির চলায়।

আবার দেখুন:

'...তাহারা হাঁপাইতেছিল।—এই মুহূর্তে তোমাদের হাত ধরিবারে আমরা মরি; তোমাদিগের করের তালু যাহার কড়া (কার্যক্রমে নিম্নশ্রেণীর লোকদের হাতের তালুতে কড়া পড়ে, বাঁক যে বহন করে তাহার কাঁধে যে কুঁজ, এমনি বিবিধস্থানে; অনেক উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পায়ের আঙগুলিতে কড়া পড়ে; সেতার বাদকের মেজরাফ্ ধারণে হাতের তর্জ্জনীতে কড়া, এমনি বিবিধ) এখন কিছুটা তত কঠিন নহে, তাহা, সেই সেই তালু স্পর্শতে আমরা ইচ্ছুক।'

কড়া, কুঁজ ও মেজরাফের চিহ্নে শরীরের এই সব সূক্ষ্ম বদল, এই রূপান্তরও এক শিল্প-কর্ম যেমন সোমনাথ হোর অঙ্কিত 'উন্ড' চিত্রমালা।

দেহের দাবি খাদ্য, আকাল এই দেহবিনাশী। খাদ্যান্বেষণে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করার সময় তবু দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষজন ভুলতে পারে না শিল্পসুষমামণ্ডিত যৌথের জীবন কাহিনী। বহুবিধ আচার, ব্রত, বিশ্বাস ও নৈতিকতা, যেসবে দেহধারণ হয়ে ওঠে জীবন ধারণ।

'তাহারা এই বিপর্যয়ে, ভাবিতে পারার তারিখা তাহারা ভুলিয়াছে, অনাহারে এখন কিছু

মনে করিতে ভাবিতে যাইলে পেট নিঙড়াইয়া মোচড়া দিবে, কহিবে, শালা সেই গিন্নি, গৃহিনী মাছটির ঘাই ! শালীর নথটা পেটময় খোঁচাইতে আছে, নথ একটি বৃত্ত যাহা স্বর্ণ বা অন্য ধাতু দ্বারা গঠিত ; ইহা স্ত্রীলোকরা নাসাপুটে ধারণ করে : মূর্ত্তি নির্দ্ধারিণে আছে যে, নথ রিপু বৃত্তির রাশ টানিয়া থাকে !'

খাদ্য-খাদক সম্পর্কে শুধু নয় মানুষ ও মাছের মধ্যে 'গিন্নি' শব্দটি ঢুকে পড়ে সম্পর্কের এক নতুন মাত্রা রচনা করে যেন প্রয়োজনটাই সব নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত এই সম্পর্ক শিল্প বিশেষ, যেখানে 'নথ' নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গও টেনে আনে। স্মরণ করায় এক নৈতিকতা, অবদমনও। আবার সেই তারাই ভেবে ফেলে '...আকালগ্রস্ত দেহের ভিতরে বাহিরে এখনও কত স্থান বাকি আছে যাহা যন্ত্রণা পাইবে ! দেহ শুকায় হাঃ যাতনা বোধ শুকায় না কেন' ? যন্ত্রণার অভিশাপ মনুষ্যজন্ম ঘিরে থাকে বলেই হয়ত ! দেহজীবনের একেকটি পাঁজড়া দিয়ে রচিত 'খেলার প্রতিভা' সেই যন্ত্রণারই এক বিশদ বিবরণ।

বড় আশা করে এ পিঞ্জরে ॥

সাহিত্যের মোড়কে অবোধ বালক বালিকার জন্য সুখপাঠ্য ইতিহাস রচনা নয়, বা সেই ইতিহাসকে প্রামাণ্য করে তুলতে মোজা নম্বর, দাগ নম্বর পেশ-ও নয়, পরচার ইতিহাসও নয়। কোনও ভীতু সমাজসেবী, বা সংস্কারক আত্মগোপন করে নেই এই রচনার আড়ালে।

দেহপিঞ্জর এখানে গীত। ১৯০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে সচেতন প্রয়াস ছিল যেন গীতের এই লাইনটিকেই ইম্প্রোভাইজ করা। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি উচ্চাঙ্গ সংগীতে, একটি কলি ফিরে ফিরে, নানাভাবে গাওয়া হচ্ছে আর তাতে একের পর এক উন্মোচন ঘটে চলেছে। এই জিনিসটা ঘটছে চোখের সামনে। তৎক্ষণাৎ।

এই তাৎক্ষণিক ধর্ম, মুহূর্তপ্রাণ খেলার প্রতিভায় গ্রামটির চলনের শ্বাস। কেউ যেন আগাম ভেবে, পরিকল্পনা করে, পাশার চালে তা রচনা করেননি। বরং যেভাবে খেলার মাঠের ধারাভাষ্য দেওয়া হয় সেরকমই। খাদ্য অন্বেষণে তাদের এই যাত্রা দেহের টানে, ঘোর বিপদে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে এক বস্তুময়তা স্বীকারে ('সেই দেহই এখন স্থানবাচক এবার পচিবে') বাধ্য করাচ্ছে। কিন্তু তারা জীব, জীব বস্তু, আবার তারা মানুষ যাদের স্মৃতি আছে । স্মৃতি আছে বলে ইতিহাস আছে, সেই আত্মজৈবনিকতা থেকে তারা মুক্ত নয়। সঙ্কটে যখন দেহ বিনাশের মুখে, দু মুঠো খাবারই যখন সব, তখনও স্মৃতি পীড়া দেয় ! স্মৃতি যদি অতীত হয় স্বপ্ন এক ভবিষ্যত।

'স্বপ্ন ইহাদের নাই, স্বপ্ন এই মহলেই নাই , স্বপ্ন এক সভ্যতার, ইহা এখান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে সেখানে যে সকল গ্রাম যেখানে শুধু বামুন কায়েতের বাস, সেখানে নারীপুরুষ শিশুরাও স্বপ্ন দেখে ; স্বপ্নে পর্যন্ত্য যদি খারাপ ভবিতব্য প্রত্যক্ষ হয় তখনই মানসিক করিল। পুজা দেয় !'

বিপর্যস্ত, সর্বনাশরাহুগ্রস্ত এই মানুষজনের স্বপ্ন বিনাশের কথাটা, স্বপ্নের নিশ্চিহ্ন

হওয়ার কথাটা কী করে তাহলে তাদের মাথায় আসে। তারা ভাবে কী করে? যখন তাদের মন স্বপ্নের বেদী নয় তখন স্বপ্নকে বাস্তবেরও বেশি ভাবার সেই স্মৃতিই বা কী করে মনে জাগতে পারে? অথচ কী আশ্চর্য, ভুলতে তারা পারছে না ওই কথা, স্বপ্নে বিপদের আশঙ্কা টের পেয়ে, বাস্তবে সুস্থ শিশুর হাতে তারা তাবিজ বেঁধেছে, মানত করেছে মনসা বা চণ্ডীর কাছে। আর এই যে দুর্ভিক্ষের বাস্তব, এর কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি, মনের কোথাও যে ছিল না, বাস্তবে ছিল না (অন্তত তারা তা দেখেনি, সংসার সুখে-দুঃখে চলে যেত ঠিকই), সে এসে তাদের ভিখারি করে ছেড়ে দিল।

ভিখারি আগেও ছিল, 'জাত-ভিখারি' কিন্তু শ্রীহীন ছিল না, সেই কাঙালও 'মা' বলে ডাকতে জানত এবং উচ্চারণ করত সেই পদটি, যা এখন আকালস্পর্শে ভীতিপ্রদ, অবিশ্বাস্য, শুনলে অন্তর শুকায় : 'ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হোক'।

এ এক মিশেল, রচনা। জীবন রচনাও বলতে পারি অনায়াসে। যেভাবে ধুতি, শাড়ির ফুটো তারা সূক্ষ্ম সূচীশিল্পে রিফু করে নিত, খাদ্যবস্তুর অভাবের কারণেও কখনও খিচুড়ি রান্না করত নিপুণ হাতে, ভবিষ্যৎ অভাবের আশঙ্কায় একমুঠো চাল সরিয়ে রাখত, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রেখে দিত একটি তামার পয়সা। এসবে অভাবকে তারা জীবনের একটা প্যাটার্নের মধ্যে স্থান দিয়েছিল, ওইটুকু কালি চালের পিটুলি গুলে, লক্ষ্মীর পা এঁকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে ফেলত। কী হবে ওই তিলটুকুকে তাল করে। এ-ও স্বপ্ন, দৈনন্দিনের সেই ছিল বেদী। হায়, আজ সে নেই! অভাব ঘর ভেঙেছে। ভেঙেছে জীবনের সেই প্যাটার্ন। এই রচনা তারই এলিজি।

ওই যে একটি ক্ল্যাসিক প্যাটার্ন ছিল, সেইটি কি আরশি যা এই 'বিরাট জনসঙ্ঘ' ভাঙতেও দেখে? এর প্রতিই কি, 'মেয়েছেলেটির' সেই 'ভাঙা টুকরো' চুড়িটির প্রতি তাকিয়েই কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'হে সত্যযুগের আয়না আমাদের ভোগান্তির শেষ কোথায়?' কিন্তু এই রচনায়, জনসঙ্ঘের এই শেষহীন, স্বপ্নবিনাশী যাত্রায় যেহেতু বাবুসকল, এলিট শ্রেণীর মুখও বিদ্যুৎচমকে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তাই এরকম হুতাশন, এরকম স্টেটমেন্টও আকাশবাণীর মতো শোনা যায়, 'আমরা আমাদের মধ্যরাত দ্বারা তোমাদের বিয়োগ করিলাম'। পাঠক মধ্যরাত প্রসঙ্গে 'মিডনাইট'স চিলড্রেন' স্মরণ করুন। হাঃ সাধের স্বাধীনতা!

তাই কি হাত এমন, 'দেখ লো চুলের কি বা দশা', 'মরণ', 'এ কোন অশান্তি গো!'

বিচ্ছিন্নদের পরিত্যক্তদের বিলাপ (বিলাপ এই রচনায় শিল্পের মাত্রা পেয়েছে) :

...'বিস্মৃত হইও না যে আমরা উপছাইয়া আছি, আমরা সতত তোমাদের পথ চাহিয়া রহি, আমরা সঞ্জীবনী ; আমাদের বাহু তোমাদের শিথান, আমরা চাল কাঁড়াই, আমরা আঁধারে ল্যাম্পো ধরি...আমরা সুচে সুতো পরান ভুলি নাই!' সেই তাদেরই একজন বলে ওঠে : 'হ্যাদে দেখ তোমরা ; মোর হাত এতাদৃশ কেন, কেন এ মরণ দশার ছাইপাশ হলুদ রঙ'। যারা নাকি মৃত্যুর উল্লেখ করত, বিয়োগের কথা বলত ভিন্ন সুরে ও ভাবে। তাতে প্রকাশ থাকত গভীর মায়া, গভীর সম্বন্ধ। 'আমার মরামুখ' দেখবে

গোছের বাক্য উচ্চারণ করত। হাত, চুল, মুখ, চক্ষু, তাদের বক্ষ ও পাঁজরে মুদ্রিত ছিল ওই সম্বন্ধ। হলুদমাখা হাত নিপুণ রন্ধনশিল্পীর, মঙ্গলাচারের গাত্রহলুদ, এখন হলুদের অর্থ ন্যাবা। এখন তাদের জিহ্বা শুষ্ক, এখন প্রাণ দেহ ছেড়ে যায় যায়। দেহ খাঁচা, একটি বস্তু মাত্র পড়ে থাকবে।

'শুধু নাসিকা সক্রিয় আছে! শ্বাস লইতেছে, তাই তাহারা শুঁকিয়া অন্য কোন গল্প বাহির করিবে'।

গল্প বস্তু ও সংগীত বস্তু ॥

মনে হতে পারে রূপকথা। যদিও জীবনযাপন কৌমের ক্ষেত্রে, চাকর বাকরের আচরণ নয়—আমরা জানি। সেখানে রচনার, সৃষ্টির স্পষ্ট ভূমিকা প্রত্যক্ষও করেছি। সেসবের মুদ্রা, সুর রূপকথাকেও হার মানায়। যেমন,

এক যে ছিল বুড়ি, নাতি হওয়ামাত্র সে আঁতুর ছেড়ে দৌড়ে যেত হাল ও হাল গোরুর কাছে, ডেকে ডেকে বলত, ওগো আমার নাতি এসেছে! যেত পুকুরের কাছে, বলত, ওগো আমার অমুকের কোলে সোনার চাঁদ এসেছে। ক্ষেতের কাছে গিয়ে বলত, ওগো ক্ষেত আমার নাতির যেন হাসি থাকে। রাস্তার কাছে গিয়ে বলত, ওগো রাস্তা আমার নাতি যেন সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরে।

এই বৃদ্ধা তার স্বামী পুত্র, পুত্রবধূরা, নাতি নাতনি ও প্রতিবেশীদের 'নিমিত্ত মৎস্যসকল এক নিয়মিত সময়ে ঘাটে ওতঃপ্রোত হয়' এবং এইটিই গল্প 'খেলার প্রতিভা'র। বা, এরকমই অজস্র গল্প জীবন্ত কৌমের খেলার প্রতিভায়। এ প্রতিভা পুস্তক রচনায়, কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখায়, সূত্র আবিষ্কারে গড়ে ওঠেনি। বেঁচে থাকা, বাঁচার নান্দনিকতা সৃষ্টিতেই তার প্রকাশ। আধুনিকতার একটি দুর্লভ লক্ষণ অজ্ঞাত, অনুচ্চারিত থেকে যাওয়া—মৎস্য সকলের মতোই তা এ জীবনে ওতপ্রোত। আবার ওই বুড়ির গল্প রূপকথাও বটে। কেননা এতে আছে আলোআঁধারি, আছে সমাজ-অর্থনীতির সূত্রগুলিকে অস্বীকারের প্রবণতা, মূর্ত বাস্তব ওই বুড়ির কাছে প্রায়শঃই অর্থহীন, প্রলাপ। এই যে অযৌক্তিকতা, উন্মাদ-সদৃশ এই অস্বীকার তাকে যেন ঠেলে দেয় বাস্তবের বৃত্তের বাইরে। সে হয়ে ওঠে রহস্যময়।

সার্বোক, সনাতনপন্থী লেখকধর্ম কমলকুমারের মধ্যে থাকায় অতীত শত হলেও গর্বের, বর্তমান এক পতন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। গ্রামজীবনের এই সমবেত গীতে তাই অস্পষ্ট হলেও যেন শোনা যায় ইপটার (আই পি টি এ) গানের সেই কলিটিও 'হঠাৎ কখন এল শমন অনাহারের' ইত্যাদি। তদবধি শুধু যাত্রা, শুধু রাস্তা, বাঁধ, প্রান্তর।

বাঁচার প্রেরণা তবু অনিঃশেষ, দিগন্তও অতিক্রম করবে তারা আমানির খোঁজে। এ গল্প তাই দুর্ভিক্ষের, অনাহারের।

…'বাঁচিবার জন্য প্রতিতেই স্বীয় দেহকে মা ভাবিল ও সেখানে লুকাইতে চাহিল'—গল্পবস্তু মুহূর্তে সঙ্গীতবস্তু, যা ঘাটের ঝাঁক ঝাঁক মাছের মতোই ওতোপ্রোত। অক্ষর

ও শব্দের না হলেও সব শিল্পেরই নিজস্ব ভাষা আছে। সাহিত্যের ভাষা যে মানসিক চিত্রকল্প সাংবাদিকতা-সর্বস্ব এখনকার বাংলা গদ্যের চাপে আমরা তা ভুলতে বসেছি। সুর ও বাণী যদি সঙ্গীতের আত্মা ও দেহ হয় তাহলে 'খেলার প্রতিভা' প্রায় পৌঁছে যায় সঙ্গীতের প্রান্তে। জনসঙ্ঘের যাত্রার বিবরণ পেশের ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলতে থাকে। কমতে-কমতে খোসা তথা বহিরাবরণ ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে কতবার তা হয়ে ওঠে ওই নির্যাসটুকু, যা সঙ্গীত।

মন্দিরের যেমন স্তম্ভ। কাঠামোটি দশ হাতে ধরে রাখে। অজস্র গল্পবস্তুর খেলার প্রতিভা টেরাকোটায় খচিত অসংখ্য দৃশ্য। হাজার-হাজার মানুষ পুতুলের কর্মরত ও বিভিন্ন ভাবের মন্দির চিত্র যেন। কিন্তু এখানে সঙ্গীতবস্তু স্তম্ভগুলি। তা করুণ রস, বাৎসল্য ও আরও বহুবিধ রস সৃষ্টির তা পাঁজর। হারমোনিয়ামের রিড হাভাতে মানুষজন। তাই দেহ এতখানি। নেই নায়ক নায়িকা, চরিত্র, এমনকি আমরা জানতে পারি না একজনেরও নাম।

এই রচনার স্থান কাল আছে। আছে একটি লৌকিক পটভূমি। দক্ষিণবঙ্গ। দক্ষিণ-বঙ্গের খাল-খাঁড়ি-নদী ও স্থলভাগ পরস্পর মাখামাখি। তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এখানে গল্পবস্তু ও সঙ্গীতবস্তুও সেই জলস্থল। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তারা প্রকট না করে আত্মগোপন করেছে পরস্পরের মধ্যে। যেজন্য সঙ্গীত এখানে চিন্তাও। গল্পবস্তু ল্যান্ডস্কেপ। কেন্দ্র তাই একটি নয় বহু, অজস্র সৌর সংসার। প্রান্ত যেজন্য টানতে পারে। আবার এরকম একটি প্রকৃত গতিশীল প্যাটার্ন যেহেতু নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে গড়ছে তাই কেন্দ্রেরও আছে দারুণ পরিবর্তনশীলতা।

একটি বাক্যাংশ…'কল্পনার চোখ অবধি জল।' বিসর্জনের প্রতিমার চোখে দশমীতে যা দেখে থাকেন কল্পনাপ্রবণ মানুষজন। এখানে এই মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণ সুন্দরবনের লৌকিকদেবতা দক্ষিণ রায়ের 'অদ্ভুত কল্পনার চোখ' সম্পর্কে। আমরা দেখব শৈল্পিক সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যরক্ষায় কী অসামান্য নৈপুণ্যই না দেখালেন কমলকুমার। এবং এই নৈপুণ্যের একটি গাণিতিক স্তরও রয়েছে :

মন্তব্যটির একটি প্রেক্ষাপট আছে, তা এরকম :

…'মহান দাতা চাউল যখন দিতে আসেন, তখন অসংখ্য হাভাতে তাঁহাকে ঘিরিয়াছিল, হাভাতেরা আঁচড়াইল, কামড়াইল, প্রহারিল ; দাতা রক্তাক্ত দেহে মরিলেন, চাউল ছড়াইয়া পড়িল, চাউল পাখীতে খাইল! আমরা বলি যে ঐ ঘটনা মিথ্যা মানিতে চাহি না।'

এ ঘটনার সত্য মিথ্যা অপ্রাসঙ্গিক। প্যালাস অ্যাথিনে যেভাবে জিউসের মাথা থেকে ভূমিষ্ঠ হন পূর্ণরূপে। সমগ্র হিসাবে। যাকে আমরা অখণ্ডরূপ ও আকৃতি বলে থাকি। জিউসের থেকে অ্যাথিনের জন্ম তায় সৃষ্টিই বড় কথা। লেখকের থেকে লেখার। যেন এরকম এক অখন্ড রূপ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ছিলই। লেখক আবিষ্কর্তা মাত্র।

মহান দাতা ও হাভাতের এই সঙ্ঘর্ষ প্রকৃতই না ঘটেও থাকতে পারে। কিন্তু খেলার প্রতিভায় এটা ঘটল আচম্বিতে, কল্পনার তাতে কিছু অবদান আছে। সেই চোখ, দৃষ্টি সে। কিন্তু এ দৃশ্য তো তাকেও পীড়া দেয়। কল্পনার চোখ, জল, এইসব এখন জলবৎ। গ্রন্থের শুরুতে, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যাংশে কমলবাবু যে লিখেছেন…'আমরা হই অতীব সরল, যেইটি হয় আমাদের সব' এ আদৌ লেখার ঝোঁকে, লেখা নয়। এ দেশীয় শিল্পকর্মের রসাস্বাদনে শুধু নয় রচনায়ও কোনও নৈর্ব্যক্তিক রক্তহীনতার স্থান নেই। কীর্তনিয়ার দু-চোখে অশ্রুধারা নামে।

আবার লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে জজিয়তি নয়, রুমালের খুঁটে আড়ালে কে চোখ মুছতে যাবে এখানে! লেখা তো মায়া, জাদু, আমি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করলাম—এ রকম ঘটেনি, ঘটতে পারে না। তাতে অভিঘাত বেড়ে গেল আরও বহুগুণ। সৃষ্টি ও ধ্বংসে, স্বীকার-অস্বীকারে, শিশুর সারল্যে নির্দেশিত হল একটি দিক—এই মরুভূমি আমার দেশ নয়, সেখানে এমন নির্দয় ঘটনা ঘটে না।

এ তাই দুঃস্বপ্ন। আবার তা চিত্রকল্প, চিত্রভাবনাও বটে। ব্যঞ্জনাময় এক প্রতীক। অন্যভাবে, অন্যভাষায় তা ব্যক্ত হবার নয়। সাহিত্য ভাষা-শিল্প, তাই এই উন্মোচন ভাষাতেই। কিন্তু সে ভাষা চিরনবীন, সদ্যোজাত, তার শরীরে সেইরকম রোঁয়া আছে, রক্তের দাগও।

বক্তৃতামঞ্চ নয়, সম্পাদকীয় স্তম্ভ নয়, প্রতিবেদন নয়—এইসবে ভাষা নিঃশেষিত, জীর্ণ হয়েছে। চোখ ও জল এই রচনায় আরও কয়েকবার ঘুরে ফিরে এসেছে, তা আকাশ ও শিশির হয়েছে : 'শিশিরে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়।' এভাবে ধানের শীষ ও তার উপর একটি শিশিরবিন্দুর ইতিহাস সমৃদ্ধতর হল।

বুড়ি পৃথিবী ॥

পৃথিবী এক বৃদ্ধা, ঢের-ঢের বয়স হয়েছে এখানকার নরনারীদের। সভ্যতা পত্রমোচী বৃক্ষ হতে না পেরে কেবলই জীর্ণ থেকে জীর্ণতর। আর নেই নতুন কোনও গল্পের সম্ভাবনা। শিল্প তাই ঐতিহ্য শোষণকারী। এখানে জং ককতোর সঙ্গে কমলকুমারের কোনও ভেদ নেই। একমাত্র পুনরুজ্জীবনেই রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নতুন শিল্প। তাই ফিরে তাকাও উৎসের দিকে। মানুষের অন্তর্গত নির্বাসনের বীজ রয়ে গিয়েছে ভাষার মধ্যেই। ভাষা শিল্পী এই ইতিহাস খুঁড়ে দেখবেন ও কিছু হীরকখণ্ড তুলে আনবেন এটাই সঙ্গত, স্বাভাবিক। আধুনিক লেখক তাই একান্তভাবেই হবেন এক মননশীল পাঠক। তাঁর সৃজনক্ষমতার একটি বড় স্তম্ভ হল উঁচুদরের ওই পাঠকবৃত্তি। সৃজনক্ষম এই পাঠকের রচনা বস্তুত এক সমালোচনা, ব্যাখ্যা, টীকা ও মন্তব্য। একালে তাই ঈশ্বরপ্রতিম লেখক নেই, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হয়ত এই মৃত্যুঘণ্টা বেজেছিল, সাহিত্যভাষা সৃষ্টির ঊষাতেই, মহাকাব্য রচনার কালেই। আমরা কান পেতে শুনিনি এইযা।

ককতোর 'অর্ফি' চিত্রনাট্যের কথা স্মরণ করুন। বাঙালি নারীর নিতান্ত ঘরোয়া বিস্ময়-প্রকাশ ধ্বনি 'ইস মাগো!' ককতো স্পর্শ করে উচ্চারিত হচ্ছে এমনটা কখনও দেখিনি। ককতোর চিত্রনাট্যে আয়নার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর আগমন ও নিষ্ক্রমণের কথা আছে। আর 'খেলার প্রতিভা'য় দেখি :

'আয়না বহিয়া, আয়নার ভিতর দিয়া আইসে ; ইস মাগো!··· এ হেন যে ভাবিল, যে মৃত্যু আয়না দিয়া আইসে, সেই কবি সাক্ষাৎ কত পুণ্যের !'

পাপপুণ্যের গপ্পে আমরা না হয় নাই থাকলাম কিন্তু আমরা তো জানি দুর্ভিক্ষ-মিছিলে এমন নারীও আছে যার বর্তুল হাত আজ হাড়-সর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও সে হাতে চুড়ি এখনও আছে। এবং ওই চুড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ হবে, সেখানে প্রতিফলিত হবে আলো।

'ঐ চুড়ী ভাঙ্গিবে এবং এই কূট বাস্তবতার সহিত মিশিবে। তখন জলে জল!'

অতি সাধারণ, গ্রামের এই মেয়েদের জলের সামনে মুখ রাখতেও দেখেছি। জল তখন আয়না। সেখানে নিজের মুখ নয় তারা মৃত্যুনারীকেই দেখে, যা দুর্ভিক্ষও বটে। ককতোর প্রতিভার থেকে এই গ্রামীণ মেয়েদের প্রতিভা তাহলে কোনও অংশে কম নয়। তারা এসব কথা লেখেনি, ফিল্ম বানায়নি। শিল্প তাদের জীবনে ওতোপ্রোত। শিল্প বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র হয়নি বলেই গ্রামের ওই মেয়েটি ও অন্যরা ককতো নয়।

তারা ভয়ঙ্কর এক দুর্দশার শিকার। ধ্বংস হচ্ছে জীবন, যে জীবনে ছিল হাজারো সূক্ষ্ম শিল্প। ওইসব জীবনশীর্ষ, তারা ভাবে। আর এখন কী মর্মান্তিক পতন।

এরা যে অনাহারে জীবন কাটাবার জন্য জন্মায়নি, এদেরও অলঙ্কার বুদ্ধি ছিল, সেসবের আর চিহ্নমাত্র থাকবে না। ভয়ঙ্কর ও সর্বগ্রাসী সেই নেতি, সেই 'না'-এর বিপুলে যা মিশবে, যা পড়বে সমস্তই না হয়ে যাবে। জলে যেমন জল।

এই প্রসঙ্গে কমলবাবু গোতিয়ের এক চিত্রকল্প আমাদের স্মরণ করান :

'গোতিয়ে-এর লেখার মধ্যে এমন এক জলাশয়ের কথা আছে, পদ্মের মধ্যে নৌকা ভ্রমণ— এখানে শব্দের ennui শব্দের ব্যবহার লাগসই!'

অন্যত্র—

···'মহিমার এবম্বিধ যোগপাট! হাঁস, জলকণা, মেয়েছেলে!'

মানবের শৈশবের স্বপ্ন, বাস্তব, রূপকথা। কমলকুমারের স্মৃতিকাতরতা বলে একে গণ্য করলে ভুল হবে। এখানে গোতিয়ে প্রসঙ্গে এমন এক কাব্যামোদে তিনি ডোবেন যে এরপর নৈঃশব্দ ছাড়া কিছু থাকে না। এ যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলি তেমনি একটি ফাঁক রচনাও বটে। ওই ফাঁক, ওইটুকু যতি তথা বিরাম ভারসাম্যের স্তম্ভ বিশেষ। গদ্য-পদ্য এতে একাকার। 'খেলার প্রতিভা' সময়চ্যুত, স্থানচ্যুতও বটে। স্থান কাল তখন পৃথিবী ও আদি অন্তহীন সময়। কমলকুমার তখন লেখক নন। আবার ইতিপূর্বে লেখকের মৃত্যু সম্পর্কে আমরা যে কথা বলেছি তাঁর অবস্থান হুবহু সেইরকম না—লেখকের

(সাহিত্যিক অর্থে) নয়। বরং বলা যায় তিনি এক অন্তর্বর্তী লেখক। তাঁর অবস্থান ধ্রুপদী লেখক ও না-লেখকের মধ্যে।

এখানে প্রতিভার যে খেলাটি আমরা ক্রমোন্মোচিত হতে দেখি তা যেন বার্গম্যানের ছবির চিত্রকল্প : মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলা।

দৃষ্টান্ত : ১

'ও পো'র বাপ, ত্বরা পাকুড় পোঁত গে !

ও পো'র বাপ, কোমর বাঁধা, কাঁঠাল পোঁত গে।

ও পো'র বাপ, জলদিকর উত্তরেতে নিম পোঁত গে'।

এই ছড়া, সংগীত ছন্দ শেষ হতেই গদ্যকারের টীকা ও মন্তব্য—

দৃষ্টান্ত : ২

'পাকুড় তথা অশত্থ ঐ মহৎ সনাতন বৃক্ষ উহার ধর্ম্ম হইক, কাঁঠাল উহার মলমাসের খাদ্য, নিম উহার দুয়ারে ঢাল তলোয়ার লইয়া জাগুক ! তাহা সত্ত্বে বেচারীকে উক্ত মাতৃরূপ সকল আটকাইতে গোহরানিল ; এবং চাঁকতেই সে ক্রমে বিকট হয় ! হায়, সময় যদি ঈদৃশী খুনখারাবী কালসিটে গ্রস্ত না হইত ; ভগবানের মার যদি না নামিয়া আসিত !'…

ভগবানের মারে, আকালের গ্রাসে মৃত্যু পথযাত্রী ওই মানুষজন অশ্বত্থ, কাঁঠাল ও নিমের মধ্যে বৃক্ষ নয় প্রত্যক্ষ করেছিল মাকে। তারা প্রকৃতিমানুষ, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই মৃত্যু, যে মৃত্যু ক্রমে গড়ে উঠেছে, অগোচরে এবং এখন চাঁকতে বিকট। মৃত্যুর এই ঘেরাটোপের মধ্যেও কী করে মেয়েটি চক্রাকারে নাচে।

…'আঃ ঐ সেই ঘুরন্ত অবলা !'

যেন বসুধা। আবার এইটি প্রতীকতম হওয়ায়, লেখকের হস্তক্ষেপও ঘটে, 'এখানে উল্লেখ যে এইভাবে ক্রমান্বয়ে চক্র দেওয়া অসম্ভব—কিন্তু আমাদের বাস্তবতা বোধের মীমাংসায় উহারা আষাঢ়ে নহে'।

আমাদের শৈশব, জীবন অন্যরকম ছিল। এইটি গর্ব। এইখানে কমলবাবু বড় মাপের ধ্রুপদী শিল্পী। লক্ষণাদি মিলে যায়। ভবিষ্যৎ জানি না। কিন্তু একথা যেন হলফ করে বলতে পারছেন আমাদের অতীত ছিল স্বর্ণখচিত। সেই অহঙ্কার ও গর্বে ঘুণ ধরেছে। আকাল তাই চাঁকতে বিকট হলেও তার দাঁত অতীত গৌরব ধ্বংস করে চলেছিল অনেক আগে থেকেই ইংরেজ জমানার ভূমিসংস্কার, সহজ স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থার উপর সিভিল কোর্ট স্থাপন, রেলপথ, জেলখানা, সবই এককেটি দাঁত।

কেমন ছিল সেই অতীত : আঁধারে লাঠি ঠুকে বা হাততালি দিয়ে চলেছি—পাছে সাপের গায়ে পা পড়ে, পরের ক্ষেতের জল কেটে নেওয়ার গল্প শুনে, যারা কাটে সমস্বরে তাদের ডেকেছি—'ও তোরা আয়, আমাদের দেশে, ছিঃ পরের আল কাটা' !

আর এখন ঘুরন্ত অবলার কেশ উড়ছে। 'আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' যে আমরা পেট না পড়ে ভেবে শুকনো চাল চিবিয়েছি, কারও শুষ্ক মুখ দেখে আগাম বলেছি,

তুমি বড় ক্ষুধার্ত, এসো চাট্টি মুখে দাও। দুয়ারে যে এসেছে তাকেই অতিথি গণ্য করেছি। কত গল্প আছে এ নিয়ে।
এখন 'আকালের ঘাস মানুষের মাই খায় !' ...'হায় এ দেহতে মানুষ ও প্রকৃতি দুইই মরে'।

নির্বাসন ॥

বেচাকেনা নয়। বেচাকেনার শিল্পে জ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে স্পর্শাতুর, উৎসাহী হওয়া চলবে না। যেভাবে হোক তাকে একটা সরল রেখায় পাঠকের তুষ্টি করতে হবে। কখনও তা গল্প সাজানোর গোয়েন্দাগিরি, কখনও-বা সমাজপিতাদের কথা মাথায় রেখে মোটা দাগের সমাজচেতনা ইত্যাদি করে যেতে হবে। শিল্পের মোড়কে জোলো সমাজতত্ত্ব, বা নীতিকথা একদিকে, অন্যদিকে বয়ঃসন্ধিক্ষণে পড়া চটি পর্নোপুস্তক নীল শায়ার উন্নত সংস্করণ কিংবা গোয়েন্দা গল্প। সকলের পথ তো হতে পারে না, একটা ধাতের ব্যাপারও থাকে। কমলবাবুর ছিল শিল্পের ধাত, তাই তাঁর পুরস্কার নির্বাসন।
'খেলার প্রতিভা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। দেশে নকশাল বিপ্লবের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়ারও পরে। নকশাল বিপ্লব সাতচল্লিশ-উত্তর দেশে গ্রাম ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের কথা বিপুল চিৎকারে, রক্তপাতে এবং আত্মত্যাগে একেবারে সামনে এনে দেয়। গ্রাম ও বিপ্লব জড়িয়ে বেশ কয়েকজন উপন্যাস-টুপন্যাস লিখলেন তখন। তাঁদের অনেকের ব্রাহ্মণ বিদায় ও সমাধা হয়েছে পুরস্কার দিয়ে। সত্তরের সাহসী ছেলেরা গ্রামের পতাকা হাতে নিলেও এই অবোধরা গ্রাম ও গ্রামসমাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না— এরকম একটা ব্যথা কমলবাবুর ছিল। হতে পারে 'খেলার প্রতিভা' রচনায় এভাবেও তিনি প্ররোচিত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়, যে ছিল তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র এবং ওই আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী। প্রিয়-র সঙ্গে কমলবাবুর অনেক তর্কের কথা একসময় শুনেছি। তর্কের কেন্দ্রে থাকত গ্রাম, গ্রামের মানুষ, সমাজ। এই তথ্যটুকু কাজে লাগতে পারে ভেবে লিখে ফেললাম।
এখন নির্বাসন প্রসঙ্গ। সাতের দশকের চিহ্ন এই রচনার ভাষায় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কমলকুমারের অন্যান্য রচনার যে সাধারণ ভাষা মেজাজ এখানে তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভাষার এই মেজাজ যেন সময়ের বিপরীতধর্মী। আবার তাই-বা কেন, সময়ের তো দুটি মুখই বর্তমান, অগ্র ও পশ্চাৎ। সময় যেতে পারে দুদিকেই। যেমন, মৃত্যুপথযাত্রীদের সম্পর্কে যদি বলা হয়, তারা অতিমাত্রায় জীবিত, তাতে ভূত ও ভবিষ্যতের টানাপোড়েনে সৃষ্টি হতে পারে এক মোক্ষম মুহূর্ত, যা সত্যও বটে।
...'এখানে "তাহারা" বদলে মানুষ লেখা যাইত, তাহাতে এখনকার ভাগ্যহীনরা চোখের সামনে হইতে সরিয়া একটা সাংবাদিক রূপ লইত, সৌখীনতা নিছক যাহা ; তাহারা ত দারুণভাবে জীয়িয়া আছে।' অথচ এই 'তাহারা'-র একজনেরও নাম আমরা জানতে পারি না, কারও সম্পর্কে বড়জোর লেখা হয়, 'আয়নাদার চুড়ী যাহার ছিল, সে'...।

ফলে 'সে' অপেক্ষা 'আয়নাদার চুড়ী' বড় হয়ে ওঠে, তাতে 'সে' নির্বিশেষ, যে আবার দেহভাষা ও কিছু মুদ্রায় বিশেষও বটে। এভাবে বহু লীলা সৃষ্ট হয়। কেন্দ্রে এক। জীবন মৃত্যু, আলো-অন্ধকার—আদি সারল্য। তা কেমন বুঝতে এই গল্পের একটি চিত্রকল্পই যথেষ্ট (অজস্র, স্বাধীন টুকরো গল্পের যে মোজাইক এখানে সৃষ্ট তার প্রতিটিই চিত্রকল্প বিশেষ) :

'আমার এই সানকিটা নদীতে ফেলিয়া দিও! ইহা দেখিলে পাখীরা চঞ্চু পর্য্যন্ত হারাইবে'—এইরকম উন্মাদকল্পনা একমাত্র রূপকথায়, লোককথায়, সারল্যের গল্পেই সম্ভব। এর এক শতাংশ কাব্যশক্তির জোরে কত লোক রাজকবি হয়ে গেল।

'খেলার প্রতিভা'র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ লক্ষ করুন :

'এই সকল লোক তথাহি দল, যে ইহাদের দেহ যেটুকু তাহাতে লজ্জা আছে, বসন যেটুকুন আছে তাহা রেললাইন আছে বলিয়া আছে, ইলেকট্রিক আছে বলিয়া, সম্মানে, স্ত্রীলোকদেরও ; হায় স্ত্রীলোকেরা, ইহাদের বসনপ্রান্ত এমনধারা যে অপরাহ্নের ঈষৎ হাওয়াতে যদিস্যাৎ শব্দিত, যদি ক্বচিৎ বেসামাল, তবে তাহারা কহিল, মরণদশা ! বাতাস কীদৃশী হয় না' !

কমলকুমারের ভাষার সঙ্গে যে পাঠক পরিচিত নন তাঁর পক্ষে একথা মনে করা অসম্ভব নয় 'ঠিক যেন বঙ্কিম পড়ছি'। কিন্তু এই পাঠক যদি একটু মনোযোগী হন তাহলে দেখবেন বঙ্কিম শুধু বহিরঙ্গে, তাও সর্বত্র নয়। আবার সাদৃশ্য যেটুকু তাই বা বঙ্কিম কেন, বলা যেতে পারে এ হল রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা গদ্য। ওই একজন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যকে এক লহমায় 'আধুনিক' করে ছেড়েছেন। এইটি নিশ্চয়ই খুবই বড় একটা প্রাপ্তি কিন্তু এই লহমা বিপ্লবের যে কিছু বিপদও ছিল আজ তা যথেষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যের হাল দেখে। বহুজনের রচনায় একটা ন্যূনতম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষাটা গড়েপিটে নিতে পারলে, বিভিন্ন-ক্ষেত্রে তাকে খাটাতে পারলে এই করুণ দশা হতো না।

এইটি কমলকুমার ভালরকম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সাম্প্রতিক জোলো ভাষা খুকু গদ্যের দিকে কোনও টান অনুভব করেননি। বেছে নিয়েছিলেন ইতিহাসের ফেলে আসা অধ্যায়ের অপূর্ণ কাজ। অতীব নিষ্ঠা এবং প্রেমে সেই কর্তব্য নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এরকম অযৌক্তিক কাজ উন্মাদ শিল্পী ও ভাষাপ্রেমীর পক্ষেই সম্ভব। কমলকুমার তাই আমাদের সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু।

নতুনের আবাহনে প্রাচীন ধ্বংস হয় না নবরূপ পরিগ্রহ করে, আরও সমৃদ্ধ হয়। একেই আমরা বলব ঐতিহ্যচেতনার সৃজনশীল প্রকাশ, যা মূর্ত কমলকুমারের গদ্যে। তাঁর উৎস সংস্কৃত সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি। এ দুই অস্ত্রে তিনি যুদ্ধ করেছেন এলিট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, বাবুদের বিরুদ্ধে। বঙ্কিমও যার অন্তর্গত। কমলকুমার বঙ্কিমের প্লট রীতি স্পর্শ পর্যন্ত করে দেখেননি। কারও সাধ্য নেই এই রচনার কোনও সারসংক্ষেপ করেন। তাই এখনকার মগজহীন সমালোচকরা যেভাবে একটি উপন্যাসের

সমালোচনা করতে গিয়ে লেখকের বলা গল্পটি ফের বলে যান, 'খেলার প্রতিভা' সম্পর্কে তাঁদের এ জাতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে এটা অনায়াসে করা যায়।

বঙ্কিম স্মৃতি শুধু 'যদিস্যাৎ', 'কীদৃশী' এইরকম দু-একটি শব্দেই সীমিত, লিখন-রীতি স্বতন্ত্র, এযেন বর্তমানকে প্রাচীনত্ব দান। যাতে 'রেললাইন' শুধু নয় 'ইলেকট্রিক'-এর থাকাটাও পিছিয়ে যেতে পারে কয়েক শতক। 'মন্দির' এই শব্দটি উচ্চারণই এখন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যদিও মনে ভেসে আসছে প্রাচীন এক মন্দির, অনুমান করুন পাঁচশো বছর পরের তাজ বেঙ্গল হোটেলটি। ওটি তখন নির্ঘাৎ প্রাচীন স্থাপত্যের এক দ্রষ্টব্য। নান্দনিক দিক থেকে না হলেও।

ধ্রুপদী মেজাজ, মোড়কে আধুনিককে, বর্তমান তথা সাম্প্রতিককে ঘিরে ফেলা, তাকে একটি সুরক্ষাবলয় দানই যেন কমলকুমারের লক্ষ্য। বা, উল্টোদিক থেকেও ভাবা সম্ভব, বর্তমান তাঁর শিল্পচেতনায় অতীত, যেন এক ভবিষ্যতের শিল্পী বর্তমানকে দেখছেন। আবার এই দেখা, লেখকের দ্রষ্টার ভূমিকাও তিনি নিজের মতো গড়েপিটে নিয়েছেন, সেকথা পরে হবে।

সাহিত্য রচনা যেমন সাহিত্যের বিকাশ আবার তা সাহিত্যের সমালোচনাও বটে, এই সমালোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উল্টোদিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কমল-কুমারকে। একা তিনিই এর প্রতিপক্ষ। কেউ একে নির্বাসন বলতে পারেন, বা হয়ত একটু শুধরে বলবেন স্বেচ্ছা নির্বাসন। আমরা একে নির্বাচনও বলতে পারি, সম্ভবত তাহলেই কমলকুমারের প্রতি শুধু নয় আমাদের সাহিত্যের প্রতিও সুবিচার করা হবে।

গল্প উপন্যাসের কাঠামো, তার ব্যাকরণ সাহেবদের মতো হতে হবে, এই মাথার দিব্যি পাকাপাকিভাবে মেনে নেওয়া হয় বঙ্কিমযুগে, আমাদের সাহিত্য সম্রাট সাম্রাজ্য বিস্তারে এই মদতটুকু করেন। আখ্যান, নকশা, মঙ্গলকাব্য, চরিতকথা, কেচ্ছা ও সমস্ত রঙ্গরস বিসর্জনে তৎপর হয়ে ওঠেন বঙ্কিম পরবর্তী যুগের লেখককুল। গল্পের টানে পাঠকতোষণ, সামাজিক বক্তব্য ও নীতিকথার মিশেলে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রজনের জন্য সাহিত্য রচনার সেই ঢেউ রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত প্রশ্নহীন, বাধাহীন তরতর বয়ে চলে। বাংলাসাহিত্যের বয়স খুব কম, তুলনায় অনেক বেশি পরিণত ; এরকম গর্বের কথাও আমরা অনেক শুনেছি। হয়ত কালে সাহেবের নন্দনতত্ত্ব আমরা হজমও করতে পেরেছি। এবং যেহেতু আমাদের সাহিত্য ভদ্রলোকের সাহিত্য, ছোটলোকের নয় এবং ভদ্রলোকরা আন্তর্জাতিক জীব তাই সেসব এখন মানিয়েও যায়। কল্লোলের পাঁকের পর থেকে ছোটলোক আমাদের সাহিত্যে এসেছে ঠিকই, আর এখন তো প্রগতিশীল সাহিত্য রচনার একটা পূর্বশর্তই হল ছোটলোক আমদানি। কিন্তু তারা এসেছে ভদ্রলোকের বিনোদনের স্বার্থে।

ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া একটি অধ্যায়ের দায়িত্ব উন্মাদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব, কমল-

কুমার সেই উন্মাদ। আমি কোনও টানটান ওঠাপড়ার গল্প বলব না, বক্তব্য পেশ করতে যাব না, শুধু মুখের ভাষা বা কেতাবের ভাষায় সাহিত্য রচনা করব না, লেখার পিছনে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনও ছক—যেন এইরকম লিখতে চেয়েছিলেন। লেখার এই রকম, কীভাবে লিখব এই প্রশ্ন থেকেই উৎসারিত তাঁর সাহিত্য। তিনি প্রাচীন ও রক্ষণশীল এই অর্থে যে রচনার পিছনে আছেন এক দ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ লেখক, আছে শীতল নৈর্ব্যক্তিকতা এবং গভীর দরদ দুই-ই।

এ শুধু বিবরণ, ন্যারেশন, ন্যারেটিভ কিন্তু সাহেবদের মতো নয়, সংস্কৃতঘেঁষা, বিশ্ব-সাহিত্য শোষণ করে রচিত বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এক বিকল্প সাহিত্য। সংস্কৃতের বোঝা ঝেড়ে ফেলে রাতারাতি স্বাবলম্বী বাংলা গদ্য নয়। গণিতজ্ঞের বুদ্ধিতে রচিত বাহারি প্লটের গল্প উপন্যাস নয়। এ এক ভাষা স্রোত যেখানে বাঙালি গার্হস্থ্য জীবন, লোকজীবনের আচার, প্রবাদ-প্রবচন, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা সমস্তই কিছু রেখে যায়, স্রোতটি হয়ে ওঠে জীবনস্রোত, চলমান এক ইতিহাস (ব্যাখা বিশ্লেষণে নয়, গ্রহণ বর্জনে নয়, তার সংগ্রহ চরিত্রে)। ইতিহাস শব্দটি এখানে খুব লঘুভাবে ব্যবহৃত হল। সঠিক শব্দটি সম্ভবত হবে বাঙালি জীবনেতিহাসের কোনও একটি পর্বের মহাফেজখানা। 'খেলার প্রতিভা' আমাদের বলে দেয় এই জীবন ইতিহাস সংস্কৃতির। জীবন যেন অজস্র উৎস ও উপাদান আর তার সৃষ্টি মাত্র একটিই, তা হল সংস্কৃতি। এই বিমূর্তকে তিনি খুঁজেছেন নানা লোকাচারে, এমনকি স্নানের ঘাটেও।

কল্পনায় বাস ॥

সোনার বাংলা কল্পনা। অতীত গৌরবের অনেকখানিই তাই অলীক কিন্তু মিথ্যা নয়। মিথ্যা ও কল্পনার মধ্যে আমরা তফাত করি।

...'আমরা সমৃদ্ধিতে ছিলাম, ঘরে মরাই ছিল—কাঁসি সমেত কুকুররে দিতাম'...এখানেই শেষ নয়...'আমরা পরের ক্ষেতের জল কাটিয়া লওয়ার গল্প শুনিয়া সমস্বরে যাহারা কাটে, তাহাদের ডাকিয়াছি—ও তোরা আয়, আমাদের দেশে, ছিঃ পরের আল কাটা'—ছিল ভূমি, জলসম্পদ, বাস্তবে কল্পনায়। তাহলে কি অনাহার ছিল না, দাসত্ব ছিল না?

তবু 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক' একথা আজও ভিখারি বলে। ভিখারি আছে, ছিল। ভবিষ্যতের ভিখারিও কি এই সাবেক পদ উচ্চারণ করে, তাতে সুর সংযোজন করে ভিক্ষা চাইবে?

এখন তো 'চিমটি কাটিলে' লাগে না, সমাজপিতা, মাথার উপরে থাকা বাবুদের উদ্দেশে নিবেদন করে 'বাবু মহাশয় ইচ্ছা করে আপনাদের কোলে মুখ লুকাইয়া এ জনমের শোধ কান্দিয়া লই', 'বাবু মহাশয় আপনকার দিককারি আমাদের বড় কষ্ট দেয়!' আবার একথাও তো মনে পড়ে যায় যে একদা তারা, এই হাভাতেরা, গৃহহীন, উৎখাত সমাজের বাইরে, দেশের বাইরে নিক্ষিপ্ত প্রান্তজন, দরিদ্র কৃষকরা ভিন্ন আচরণও

জানত : 'অতীব সন্তর্পণে আপন লাঙ্গল রাখে যাহাতে নিকোন স্থান খারাপ না হয়'… বাসি মুখে, এলোচুলে রমণীরা কখনও এই লাঙল ছোঁবে না।

এসব আর নেই, তার পরিবর্তে আছে এই চিত্রকল্পটি :

'পুলিসবর্গের দৃষ্টি হেড দারোগার পেটের, ইহা হাপরিত হইতে আছে, প্রতি আকৃষ্ট থাকে ; ততঃ ঐখান হইতে চোখ ঘুরাইয়া, তাহারা গ্রামের দিকে নেহারিল ; উহা নিথর এক বসতি চিহ্নমাত্র ; চারদিকে জল, জোয়ার ভাটা হয়, আর চাঁদের আলো !'

গ্রামটি কি তাহলে ওই দারোগা খেল, খেল আইন যে এই আকালেও 'আইন রোগা হয় নাই'। 'পুলিসবৃন্দ তদ্রূপ হাঁকিতে আছিল'…তাদের শরীরে কী একটা উড়ছে 'তবে কি উহা শরীর নহে উদ্দির্দ !' যেজন্য 'কোর্ট তোমাদের সাক্ষী নাকোচ করিবে' !

রোগা না হওয়া আইন, দারোগার পেট ইত্যাদি বাবুরা মাথায় স্থান দিয়েছেন, কোর্ট বসিয়েছেন মাথায়। আর সেসবের ভয়ঙ্কর চাপেও তারা, গ্রামটি, গ্রামগুলি, হাভাতে হল। কিন্তু প্রতিবাদ করল না, প্রতিবাদ যেন তাদের রক্তে নেই, ঐতিহ্যে নেই।

বড়জোর প্রশ্ন করতে পারে :

'পাগল ! পাগল ! আমরা কি চোর ! চোর যদি নহি তবে এ জাঁত দুর্ভোগ কেন।'

শুধু জানতে চায়, কেন তাদের এই হাঁড়ির হাল ?

এখন তারা ক্রন্দনযন্ত্র মাত্র 'হাড়সার বক্ষ ! হৃদয় নাই, ফুসফুস নাই'—

'খেলার প্রতিভা' গ্রন্থটির এক এলোমেলো পাঠ হয়ত এ রচনা। বহুজন বহুরকমে 'খেলার প্রতিভা' পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারেন, এই পর্যন্ত এসে আমার দমে এতটাই টান পড়েছে যে কষ্ট হচ্ছে। এ রচনা এখানেই শেষ হবে, গ্রন্থটির ১২৮ পৃষ্ঠায় লেখকের সরাসরি প্রবেশ ঘটে একটি বাক্যে 'কত বিবিধ ইতরোমির মধ্যে বসিয়া এই লেখা লিখিতেছি তাহা ভগবানই জানেন না।' ইতরোমি এখন লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ওই লেখকটি আর নেই।□

কমলকুমার এই রচনায় ক্ষুধার তুলনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় স্মরণ করেছেন বাসওয়ালৎ-এর খোদিত চণ্ডিকা মূর্তি। ওই মূর্তির উদরে এক 'ক্রূরকর্মা' বৃশ্চিক আছে।